নির্বাচন কমিশনের আরপিও সংশোধনের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২০ আগস্ট ২০২২)

এক.

নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধনের একটি প্রস্তাবনা আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠিয়েছে, যাতে এর ১৭টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ভোট বাতিলে নির্বাচন কমিশনের এবং ভোট বন্ধে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার ক্ষমতা বাড়ানো; প্রার্থীর এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখালে বা কেন্দ্রে যেতে বাধা দিলে শাস্তির বিধান; রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় বাড়ানো; প্রার্থীদের টিন সার্টিফিকেট ও আয়কর প্রদানের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করা; আবেদন ছাড়াই ভোট গণনার বিবরণ প্রার্থী ও তার এজেন্টদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করা; মনোনয়ন দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত খেলাপি বিল (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) পরিশোধের সুযোগ দেওয়া; রাজনৈতিক দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনে জমা দেওয়ার বিধান করার প্রস্তাব ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে তিনটি প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি এবং এগুলোর দুটি নিয়ে আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন। আমরা আরও উদ্বিগ্ন যে কমিশনের প্রস্তাবগুলো অসম্পূর্ণ এবং এতে আরও অনেকগুলো বিষয় যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলোর একটি হলো রাজনৈতিক দলের সব কমিটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা (ধারা ৯০-বি), যা আমরা সমর্থন করি। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হলো মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীদের টিন সার্টিফিকেট ও আয়কর প্রদানের প্রত্যয়নপত্র প্রদান (ধারা ১২-তে সংযুক্তি)। বর্তমানে আরপিও'র ৪৪ক(২) ধারায় আয়কর রিটার্ন প্রদানের বিধান রয়েছে। তাই আরপিও'র ১২ ধারায় শুধু আয়কর রিটার্নের প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কিত নতুন বিধান যুক্ত করার ফলে একটি ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে – কোনো কোনো প্রার্থী মনে করতে পারেন যে তাদেরকে আর আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে না এবং যা জমা দিতে ও প্রকাশ করতে সঙ্গত কারণেই অনেকের অনীহা রয়েছে। আমাদের এ ধারণা অমূলক নয়, কারণ আরপিওর ৪৪ক(২) ধারায় আয়কর রিটার্নের কপি জমা দেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান থাকলেও, অতীতে অনেকেই শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়ে, এমনকি আয়কর প্রদানের কোনোরূপ দালিলিক প্রমাণ জমা না দিয়েই নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনে ৫৪০ জন প্রার্থীর এক-পঞ্চমাংশই আয়কর রিটার্ন জমা দেননি *(প্রথম আলো* ৬ জানুয়ারি ২০১৪)। তাই সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝির অবসানের লক্ষ্যে আরপিও'র ধারা ১২-তেই আয়কর রিটার্ন দেওয়ার বিধান সংযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত ছিল বলে আমরা মনে করি।

আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের জন্য প্রেরিত নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো কোনো ব্যক্তি বলপূর্বক নির্বাচনী কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করলে প্রিসাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র, এমনকি পুরো নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান (ধারা ২৫এ–তে সংযুক্তি)। একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের কারণে ভোট চলাকালে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হলে নির্বাচন কমিশনকে তদন্ত সাপেক্ষে পুরো নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ফলাফলের গেজেট প্রকাশ ঘোষণা স্থগিত, নির্বাচনী ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা প্রদান। এ প্রস্তাব নিয়ে আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত, কারণ নির্বাচন ও গেজেট প্রকাশ স্থগিত ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা বর্তমানে কমিশনের ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং কমিশন তা ব্যবহারও করে আসছে। আমাদের উদ্বেগের কারণটি হলো যে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন যেন তার ক্ষমতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত নয় বা উপলব্ধি করতে পারছে না।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিশনের ধারণা যে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোটে অনিয়ম হলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা থাকলেও ভোটগ্রহণ শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তার ফল ঘোষণার পর কমিশনের আর কিছু করার থাকে না। তাই নির্বাচনে অনিয়মের প্রমাণ মিললে ভোটের ফল ঘোষণা হলেও তা গেজেট আকারে প্রকাশের আগ পর্যন্ত সেই ফল বাতিলের এবং পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা চাওয়া হয়েছে (*আমাদের সময়*, ৯ আগস্ট ২০২২)। আমাদের আশঙ্কা যে, আপাতদৃষ্টিতে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চাওয়া ইতিবাচক মনে হলেও এ ধরনের ক্ষমতা চাওয়ার ফল সম্পূর্ণ উল্টোও হতে পারে।

দুই.

আমাদের নির্বাচন কমিশন অসামান্য ক্ষমতাধর একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে চারটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন; (২) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন; (৩) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; এবং (৪) রাষ্ট্রপতি ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ। এসব নির্বাচনে 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে'র ক্ষমতা কমিশনকে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম* মামলায় [৪৫ ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] আমাদের আপিল বিভাগ রায় দেন: "আমাদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইনি কাঠামোতে 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে'র বিধানের অধীনে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (inherent power) কাজে লাগিয়ে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে আইনি বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযোজনও করতে পারে।" অর্থাৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের

ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ এবং আইন যেখানে অসম্পূর্ণ, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশন নির্দেশনা জারির মাধ্যমে সেই অসম্পূর্ণতাও দূর করতে পারে।
সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে শুধু বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযোজনই নয়, ফলাফল ঘোষণার পরও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। *নূর হোসেন বনাম মো. নজরুল ইসলাম* মামলার [৪৫বিএলসি (এডি)(২০০০)] রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেন, "আমরা এ কথা পুনঃব্যক্ত না করে পারি না যে, নির্বাচন চলাকালে গোলযোগের, ব্যালট পেপার কারচুপির বা নির্বাচন সঠিক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে রিপোর্ট বা অভিযোগ উত্থাপিত হলে, উক্ত রিপোর্ট বা অভিযোগের সত্যতা যাচাইপূর্বক কমিশনের ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক।" আমাদের বিজ্ঞ নির্বাচন কমিশনারগণ অবগত আছেন যে, উচ্চ আদালতের রায়ও আইন এবং তা মানা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

আর সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এই স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ন্যায় সুরক্ষাও দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১২৬ অনচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদান নির্বাহী বিভাগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ না দিয়ে কোনোরূপ আদেশ প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ আদালতও যাতে কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে বিধানও আমাদের সংবিধানে রয়েছে [অনুচ্ছেদ ১২৫(গ)]। এছাড়াও আমাদের নির্বাচন কমিশনকে আরপিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনেরও নেই। অর্থাৎ আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের কমিশনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা রয়েছে।

এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমাদের নির্বাচন কমিশন অতি সহজেই নির্বাচন বাতিল, গেজেট প্রকাশ স্থগিত ও পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে আদালতের রায়টি কার্যকর করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই ক্ষেত্রে কমিশনের জন্য সঠিক ও অত্যন্ত সহজ সমাধান ছিল আদালতের নির্দেশ সংযুক্ত করে নতুন করে আরপিও মুদ্রণ করা অথবা তা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, যার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। বিজ্ঞ কমিশনারদের জানার কথা, উচ্চ আদালত কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর সংসদে সংবিধান সংশোধনের জন্য নতুন কোনো বিল উত্থাপন না করেই আদালতের নির্দেশ সংযুক্ত করে সরকার সংবিধান পুনঃমুদ্রণ করে।

নূর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম মামলার রায় কার্যকর করার আরেকটি পদক্ষেপ হতে পারে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা প্রদান করা। অন্য আরেকটি পদক্ষেপ হতে পারে এ সম্পর্কে একটি পরিপত্র জারি করা। বিধি প্রণয়নের মাধ্যমেও কমিশন আদালতের রায়টি বাস্তবায়ন করতে পারে।

তিন.

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা (order) জারির মাধ্যমে আইনের অপূর্ণতা কাটানোর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রতিবেশী ভারত থেকে। ২০০০ সালের *ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস* [(২০০০)৫(এসসিসি)] মামলার রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীদের আয়, সম্পদ, দায়-দেনা, অপরাধের খতিয়ান ইত্যাদি সম্পর্কে পাঁচ ধরনের তথ্য হলফনামার মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা না থাকায় – যা আমাদের কমিশনের রয়েছে – কমিশন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এটি তাদের *রিপ্রেজনটেশন পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১*-তে সংযুক্ত করার অনুরোধ করে। মন্ত্রণালয় তা না করে কমিশনকে আদালত থেকে সময় চাওয়ার অনুরোধ করে এবং নিজেরা একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বানের উদ্যোগ নেয়। কমিশন আদালতে সময় চাইতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্ব-উদ্যোগে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি নির্দেশনা জারি করে আদালতের রায়টি বাস্তবায়ন করে। নির্দেশনাটিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল: (১) জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীগণকে একটি নির্দিষ্ট ছকে আদালত নির্দেশিত পাঁচটি বিষয়ে যথাযথ ও সম্পূর্ণ তথ্য হলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। (২) হলফনামাটি নোটারি পাবলিক বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সম্পাদন করতে হবে। (৩) হলফনামা জমা না দিলে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। (৪) হলফনামায় তথ্য গোপন বা অসত্য তথ্য প্রদানের কারণে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। (৫) রিটার্নিং অফিসার হলফনামার কপি নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীও গণমাধ্যমের কাছে এটি উদারভাবে বিতরণ করবেন। (৫) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিরুদ্ধ হলফনামা (counter affidavit) দাখিল করতে পারবেন। লক্ষণীয় যে, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় আদালতের রায়ের পরিধির বাইরের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও পরবর্তীতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন 'না-ভোটে'র বিধান প্রচলন করে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

২০০৫ সালে *আবদুল মতিন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ* মামলায় [২০১৪ (৬৬ডিএলআর)] বিচারপতি আবদুল মতিনের প্রদত্ত হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশনও ২০০৫ সালের ১৮ জুন তারিখে এক বিশেষ পরিপত্রের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারকে আদালতের রায়টি বাস্তবায়নের অনুরোধ করে, নির্দেশনা নয়। উল্লেখ্য, বিচারপতি আজিজ আমাদের হাইকোর্টের উপরিউক্ত রায়টি ঐচ্ছিক (directory), বাধ্যতামূলক (mandatory) নয়, বলে দাবি করে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের বিএনপি সরকারের আমলে একটি কুচক্রী মহল উচ্চ আদালতের যোগসাজসে আবু সাফা নামের এক দুর্বৃত্তকে ব্যবহার করে জালিয়াতির

মাধ্যমে সম্পূর্ণ গোপনে আদালতের রায়টি ভণ্ডুল করার অপচেষ্টা করে। এর পরেও হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের রায়টিকে ভণ্ডুল করার আরও কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পরিপত্র জারির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা জারির উদাহরণও আমাদের দেশে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন 'বিরুদ্ধ হলফনামা' প্রদানের বিধান করে। এমনকি নূরুল হুদা কমিশনের সময়েও ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আরেকটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিধান করা হয়।

নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে *নূর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম* মামলার রায় আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তবুও এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হওয়াটা আত্মঘাতীমূলক হতে পারে – মন্ত্রণালয় কমিশনের প্রেরিত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত প্রতিবেশী দেশ ভারতেই আছে। কয়েক বছর আগে ভারতের *রিপ্রেজনটেশন পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১*-এর ৫৮এ ধারা সংশোধন করে ভোট কেনাবেচার ক্ষেত্রে নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য নির্বাচন কমিশন সরকারকে অনুরোধ করে। কিন্তু মন্ত্রণালয় ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের প্রেরিত এক চিঠিতে কমিশনের এ অনুরোধ খারিজ করে দেয়। আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের সিদ্ধান্তের আশঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উদ্বেগ এ কারণেই।

চার.

আমরা মনে করি যে, আরপিও সংশোধনের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরিত নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনাটি অসম্পূর্ণ। এর একটি কারণ হলো যে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কমিশনের সংলাপকালে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় না নেওয়ার অভিযোগ। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে আরও কিছু প্রস্তাব এতে যুক্ত করা প্রয়োজন। এমন বিধানের মধ্যে অন্যতম হতে পারে:

১. আরপিওতে 'না-ভোট' পুনঃপ্রবর্তন। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে না-ভোট ছিল। যে কয়টি কারণে সে নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা যুগিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই না-ভোটের বিধান। কিন্তু ২০০৯ সালে এটি বাতিল করা হয়। আমরা মনে করি, এটি আবার আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কারণ বড় দলগুলো অনেক ক্ষেত্রে পেশিশক্তি ও কালোটাকার মালিক তথা দুর্বৃত্তদের মনোনয়ন প্রদান করে। বড় দুই দল এভাবে মনোনয়ন দিলে ভোটার যে তা পছন্দ করছেন না, সেটা নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য না-ভোট দরকার। তাছাড়া এটি ভোটারদের অধিকারের মধ্যেও পড়ে। পার্শ্ববর্তী ভারতেও এ বিধান রয়েছে।
২. হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা এবং হলফনামায় নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা; যেমন: ১. প্রার্থীর বয়স; ২. বিদেশি নাগরিকত্ব আছে কিনা; ৩. আয়ের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ; ৪. কারা প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীল তার বিস্তারিত বিবরণ; ৫. সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কিনা ইত্যাদি। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন কমিশন হলফনামায় এসব প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারে।
৩. হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের সুস্পষ্ট বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্বাচনী অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা মনে করি।
৪. হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিতরণের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। হলফনামায় তথ্য গোপন করলে কিংবা ভুল তথ্য দিলে ভোটাররা বিভ্রান্ত হন। তাই হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই করার বিধান আরপিওতে সংযুক্ত করা আবশ্যক।
৫. নির্বাচনে টাকার খেলার কারণে বর্তমানে আমরা 'বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই' এমন পরিস্থিতিতে নিপতিত। তাই প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব যাচাই-বাছাই করার বাধ্যবাধকতা আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।
৬. নির্বাচনী ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থী ও ভোটারদের নিয়ে প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় একটি 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন এবং হলফনামার তথ্য ছাপিয়ে তা ভোটারদের মাঝে বিলি করার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।
৭. সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিল করার বিধান আরপিওতে যুক্ত করা জরুরি, যা বর্তমানে নেই।
৮. রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
৯. নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া রাজনৈতিক দলের অডিট করা হিসাব যাচাই-বাছাই করার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
১০. বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১১. সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি হয় হাইকোর্ট বিভাগে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সাক্ষী, কাগজপত্র, ব্যালটবক্স হাইকোর্টে হাজির করা অবাস্তব ও ব্যয়সাপেক্ষ। এতে বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। তাই এ লক্ষ্যে

বিকল্প কাঠামো চিন্তা করা আবশ্যক এবং তা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। একটি বিকল্প হতে পারে জেলা জজদের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা এবং উচ্চ আলাদতে আপিলের সুযোগ রাখা।

১২. রিটার্নিং কর্মকর্তার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে দায়েকৃত আপিল নিষ্পত্তি করার সময়সীমা বর্তমানের তিনদিনের পরিবর্তে এক সপ্তাহ করার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে যে চারটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এটি আরপিও'র বিষয় নয়। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই এটি কার্যকর করতে হবে।

পাঁচ.

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্তমানে সব চেয়ে বড় বাধা বিদ্যমান বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ না হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের বর্তমান কমিশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আচরণবিধি প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, এমনকি কমিশন আচরণবিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতা অস্বীকার করার অপচেষ্টাও করেছে। তাই বিদ্যমান বিধি-বিধানগুলো প্রয়োগের দিকে কমিশনের নজর দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ:

১. আরপিও'র ৯০খ(খ)(ই) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকা বেআইনি। কিন্তু প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল এই বিধান অমান্য করছে এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন সারাদেশে প্রতিনিয়ত তাণ্ডব সৃষ্টি করেই চলছে। তাই আরপিও'র এই বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

২. আরপিও'র ৯০গ(১)(ঙ) ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা থাকাও আইনের পরিপন্থি। তবু প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল এই বিধান অমান্য করছে এবং এসব বিদেশি শাখা প্রতিনিয়ত তাদের অপকর্মের মাধ্যমে বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। তাই অবিলম্বে রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা বন্ধের উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।

৩. হলফনামা অনলাইনে জমাদানের যে পরিপত্র রয়েছে তা প্রয়োগের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এতে প্রার্থীদের জন্য বিনা বাধায় হলফনামা জমাদান সম্ভব হবে এবং হলফনামার তথ্য দ্রুততার সঙ্গে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব হবে।

৪. তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান অধ্যাদেশ আকারে জারি করার বিষয়টি আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত ছিল (ধারা ৯০খ)। প্রসঙ্গত, ওই নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ কিছু নির্বাচনী এলাকায় এধরনের প্যানেল তৈরি করলেও, বিএনপি আইনের এ বিধানটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল। পরবর্তীকালে অধ্যাদেশটি সংসদে অনুমোদনের সময়ে এ বিধানের পরিবর্তন আনা হয়। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডের তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিত করে তা শুধু বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়। ফলে দশম ও একাদশ জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরির বিধান বহুলাংশে উপেক্ষিত হয়। অনেক আসনেই জনপ্রিয় প্রার্থীদের বদলে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাধর নেতা-নেত্রীরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেন। এতে তৃণমূলের মতামত উপেক্ষিত হয় এবং মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

৫. 'বিরুদ্ধ হলফনামা' বা কাউন্টার এফিডেভিট প্রদানের বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানো আবশ্যক।

ছয়.

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচন কমিশনের অতুলনীয় ক্ষমতা রয়েছে। আর আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোতে নির্বাচন মানেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের মতে: "যদিও অনুচ্ছেদ ১১৯(২) নির্বাচন কমিশনের তদারকি করার ক্ষমতার কথা বলা নেই, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাইরে অন্য কিছু ভাবার কোনো অবকাশ নেই এবং যে আইন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনের হাত বেঁধে দেয়, তা সাংবিধানিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হবে।" (*কনস্টিটিউশনাল ল, তৃতীয় সংস্করণ*, পৃ. ৯৭৩) অর্থাৎ যেনতেন প্রকারের বা কারচুপির নির্বাচন সাংবিধানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি সকলেরই জানা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মতো একটি মীমাংসিত পদ্ধতি একতরফাভাবে বাতিলের মাধ্যমে আইনকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে, যার ফলে দলীয় সরকারের অধীনে আমাদের দেশে পরপর দুটি ব্যর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ ও ২০১৮ সালে। বস্তুত দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত আমাদের অতীতের সবগুলো নির্বাচনই ছিল অগ্রহণযোগ্য। তাই বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সীমাহীন দলীয়করণের কারণে আগামী জাতীয় নির্বাচনও যে সুষ্ঠু হবে না, তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। তবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ম্যান্ডেট হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, কারসাজির নির্বাচন নয়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো নিঃসন্দেহে একটি পর্বতপ্রমাণ বাধা। তাই এই বাধা দূর করতে কমিশনকে

এখনই সুস্পষ্টভাবে সরকারকে বলতে হবে, যাতে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে এবং কমিশন তার সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ম্যান্ডেট সফলতার সঙ্গে পালন করতে পারে।

উপরোক্ত প্রবন্ধটি ২০ আগস্ট ২০২২, 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত নির্বাচন কমিশনের আরপিও সংশোধনের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত।